# ভারতীয় মুসলিম - সমস্যা ও সম্ভাবনা

**ড. মুহাম্মদ আফসার আলী**

মুসলিমরা বিশ্বজনীন জাতি; পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তর। ভারতীয় মুসলিমরা পৃথিবীর যে কোনো দেশের তুলনায় সংখ্যায় বৃহত্তম।নবী মুহাম্দ (সা.)-এর যুগ থেকেই, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই ব্যবসায়িক জাতি আরব মুসলিমরা সমুদ্র পথে ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে, মালাবর উপকূলে বসবাস করতেন। তাঁদের ব্যবহারে ও আনুগত্যে মুগ্ধ হয়ে স্থানীয় রাজা তাদেরকে 'মোপলা' (অর্থ, ম পলা বা আমার সন্তান) নাম দিয়েছিলেন। স্থানীয়দের সঙ্গে বিয়ে-শাদির সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের অনেকে স্থায়ীভাবে ভারতের মাটিতে মিশে গেছেন। ভারতবর্ষে মুসলিমদের রাজনৈতিকভাবে প্রথম আগমন ৭১২ সালে তরুন আরব সেনাপতি মুহাম্ম-বিন-কাশেমের নেতৃত্বে। কিন্তু তিনি তাঁর সামরিক আধিপত্য প্রদর্শন করেই ফিরে যান। তার পরে ১১৯২ সালে সাহাবুদ্দিন অরফে মুহাম্মদ ঘুড়ির দ্বারা ভারতে পারস্য আধিপত্ত কায়েম, ১২০৬ সালে কুতুব-উদ্দিন আইবেক দিল্লির সালতানাতে তুর্কী দাসবংশ বা সুলতানি শাসন আমল প্রতিষ্ঠা ও ১৫২৬ সালে মোঙ্গালীয় চেংগিজ বীর জালারুদ্দিন মুহাম্মদ বাবর দ্বারা দীর্ঘ তিন শতাব্দী অধিক স্থায়ী বিশ্ব বিখ্যাত মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিমরা ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অধিকার নিরবিচ্ছিন্নভাবে কায়েম রাখেন প্রায় আট শত বছর ধরে।

তখন কিন্তু মুসলিমদের জনসংখ্যা খুব কম ছিল। রাজদরবারের বাইরের সাধারণ মুসলিমদের অবস্থার তেমন উন্নতিও হয় নি। শাসক স্বজাতিয় হওয়ায় তারা বিশেষ কোনো সুবিধা পান নি। বিশেষ করে বর্তমানের ভারতীয় মুসলিমদের প্রায় সকলেই (১- ২ % বাদে) তখন অমুসলিম ছিলেন। সুতরাং, প্রায় হাজার বছরের মুসলিম শাসিত ভারতে আজকের ভারতীয় মুসলিমদের অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। হিন্দু সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্ণীয় ('অচ্ছুৎ') সমাজের থেকেই যেহেতু আজকের ভারতীয় মুসলিমরা ধর্মান্তরিত হয়েছেন, তাই তাঁদের অবস্থা সেই নিম্নবর্ণীয়দের মতই সেদিনও ছিল। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ছিল গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবি, ভূমিহীন ও খেটে খাওয়া শ্রেণির মুসলমান ও তাঁদের ধর্মান্তরনপূর্ব হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণীয় সম্প্রদায়ের। অন্যভাবে বললে - বাঙালি, উড়িয়া, বিহারী, তামিল, কানাড়ি, মারাঠি ইত্যাদি ভারতের মূলনিবাসী সম্প্রদায়ের (ধর্ম নিরপেক্ষ) অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। কারণ, সাধারণের উন্নতির সোপান শিক্ষাকে মুসলিম শাসকরা সার্বজনীন করেন নি। রাজদরবারের সান্নিধ্যে ধন্য গুটিকয় মুসলিম ও অধিক সচেতন উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা রাজ-ভাষা ফার্সি শিখতেন রাজদরবারে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে। বাদবাকি জনগণ হয় সৈন্যবাহিনীতে বা ক্ষেত-খামারে গা-গতরে খেটে খেতেন। সুতরাং, দীর্ঘ আট শতাব্দীর মুসলিম শাসনের শেষলেগ্নে ভারতীয় সমাজের অগ্রগতির বিন্যাস ছিল – রাজদরবারের আনুকূল্য ধন্য খুব অল্পসংখ্যক মুসলিম পরিবার ও উচ্চবর্ণীয় হিন্দু সম্প্রদায়রা অনেকটা এগিয়ে, আর নিম্নবরাণীয় হিন্দু ও তাঁদের থেকে ধর্মান্তরিত মূলনিবাসী গ্রাম-গঞ্জের মুসলিমরা অনেকটা পিছিয়ে।

এই অবস্থায় দেশের শাসনক্ষমতা বিদেশী বৃটিশদের হাতে গেল। সাধারণ প্রতিযোগিতার নিয়মে অগ্রবর্তীরাই সফল হয়। এখানেও তাই হল। আর্থ সামাজিক অবস্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণীয় হিন্দু ও মুসলিম সমাজের ক্ষুদ্র অভিজাত অংশটিরই বিশেষ সুবিধা পাওয়ার কথা ছিল; কিন্তু বৃটিশ শাসনের প্রথম দিকে (মূলতঃ ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৮) মুসলিমদের প্রাণপণ বৃটিশ বিরোধীতা অগ্রবর্তী অতি ক্ষুদ্র মুসলিম সমাজকেও প্রত্যাশিত রাজানুকূল্য পাওয়ার পরিবর্তে রাজরোষে ফেলে। ফলস্বরূপ, স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ (১৮৫৭-৫৮) ব্যর্থ হওয়ার পরে দোর্দণ্ডপ্রতাপ বৃটিশ রাজশক্তি বিদ্রোহে নেতৃত্বদানকারি ভারতের মুসলিম জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। তারা আর দাড়াতে পারে নি, আজও না! কিন্তু অন্য দিকে উচ্চবর্ণীয় হিন্দু সম্প্রদায়টি অগ্রবর্তী হওয়ার সকল সুজোগ লাভ করে রাজানুকূল্যে আরও এগিয়ে যায়, পুরো দেশের নেতৃত্ব দেওয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকে। তারই ফলশ্রুতি হল ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতিয় কংগ্রেস। এই প্লাটফোর্মে শিক্ষিত, সজাগ উচ্চবর্ণীয়রা নিজেদের অমুসলিম সমাজকে সংগঠিত করতে লাগলেন, বৃটিশ-উত্তর ভারতে সংখ্যাভিত্তিক গণতান্ত্রিক ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করতে লাগলেন। অন্যদিকে মুসলিমরা আধুনিক শিক্ষা থেকে তখনও অনেকটা দূরে, সদ্য আলিগড় আন্দোলন থেকে অল্প সংখ্যক শিক্ষিত, সচেতন মুসলিম তৈরি হয়েছেন মাত্র। তারা কংগ্রেসে নেতৃত্ব, সম্মান ও ভবিষ্যত খোজার চেষ্টা করলেন, কিন্তু হতাশ হলেন। তাই, নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য একটা সংগঠন তৈরি করলেন, নাম দিলেন 'ইন্ডিয়ার মুসলিম লীগ'। নিজেদেরকে সংগঠিত করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ১৯৪৭-এ দেশভাগের ফলে নেতৃস্থানীয়রা বর্তমান ভারতের ঐপারে চলে গেলেন। কিন্তু পৃথিবীর যে কোনো দেশের তুলনায় বেশি সংখ্যক মুসলিম ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে আপন করে নিয়ে থেকে গেলেন। দিন যত যেতে লাগল, পরিষ্কার হতে লাগল যে ভারতবর্ষের মুসলমনরা প্রকৃত অভিভাবকহীন। লোক দেখানো অভিভাবক অনেক আছেন – কিন্তু তারা শুধু মুসলমানদেরকে ব্যাবহার করার জন্য, ভোট নেওয়র জন্য, ভোটে জেতার জন্য দাঙ্গা-ফাসাদ-বোমাবাজি করার জন্য, জেলে পাঠানোর জন্য। অনেকে বলেন যে, ভারতীয় মুসলিমদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরি, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন – কোনো দল মন থেকে চান না। ফলস্বরূপ, ভারতীয় মুসলিমরা ভারতবর্ষ নামক একটা বড়ো বিস্তৃত হ্রদে ভাসমান কচুরিপনা স্বরূপ! অভিভাবক, বন্ধুর ভেকধারী রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতারণাপূর্ণ ধূম্রকুজ্ঝের ঝটকায় দিশাহীন হয়ে জলাশয়ের এপার, সেপার, ওপার করে বেড়াচ্ছে! রাজনৈতিক নেতৃত্ব না থাকায় স্থায়ীত্ব, সম্মান কিছুই পাচ্ছেন না। এর পরে সর্বশেষ আক্রমণটি হানার চেষ্টা চলছে - কী করে মুসলমানদের ভোটাধীকারটিও ছিনিয়ে নেওয়া যায়!

সমস্যা থাকবেই, সংখ্যালঘুদের সমস্যার ধরণটি ভিন্ন। তবে বর্তমানে ভারতীয় মুসলিম সংখ্যালঘুদেরকে যে সমস্যায় ফেলা হচ্ছে এরূপ সমস্যার সম্মুখিন তাঁরা আগে হন নি! বরং একথাও সত্য যে হিটলারের নেতৃত্বাধীন জর্মানি ও সু কি-এর মায়ানমারের সংখ্যালঘুরা ছাড়া পৃথিবীর কোনো দেশের সংখ্যালঘুরা এরূপ সমস্যার সম্মুখিন হন নি! আগে তাঁদের সমস্যা ছিল রুজি-রুটি, আচ্ছাদন, বাস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অভাব বা ঘাটতি জনিত পরিস্থিতির।বর্তমান সমস্যাটি হল জীবনধারনের অত্যাবশ্যকিয় এই পরিসেবাগুলোর আভাব তো মিটানো হবেই না, বরং যা কিছু আছে সবই কেড়ে নেওয়া হবে; চাওয়ার অধিকারও করে নেওয়া হবে! শুধু বর্তমানে জীবিত মুসলিমদেরকেই অধিকারহীন করার চেষ্টা চলছে তা নয়, বরং তাঁদের ভবিষ্যৎ সকল প্রজন্মের সকল রকমের

অধিকার হরনের চেষ্টা চলছে।ছলে, বলে, কৌশলে তাঁদের নাগরিক অধিকার কেঁড়ে নিলেই তাঁরা ‘অনুপ্রবেশকারি’তে পরিণত হবেন। ব্যাস – জমি, বাড়ি, চাকরি, ব্যবসা, শিক্ষাপরিসেবা, স্বাস্থ্যপরিসেবা, আইনিপরিসেবা, প্রশাসনিক নিরাপত্তা, ইত্যাদি সকল কিছু থেকেই ‘অনুপ্রবেশকারি’ সুমলিমরা বংশপরম্পরায় বঞ্চিত হবেন। শুধুমাত্র প্রায় ২.৫ কোটি মানুষের বাস আসাম থেকে সদ্য ১৯ লাখ মানুষ এরূপ ‘অনুপ্রবেশকারি’-এর তকমা পেয়েছেন; ছিন্নমূল হয়েছেন! তাহলে ১২৫ কোটির বিশাল ভারতবর্ষ থেকে শাসকের স্বরচিত এই নাগরিকত্বের পরীক্ষায় কত মানুষ ছিন্নমূল (বংশপরম্পরায়) হতে পারেন – অনুমান করতেও ভয় লাগে! প্রায় নয় /দশ কোটি নিজদেশে ‘দেশহীন’ মানুষের পরিণতি কী? পুঁজিবাদ-বিশ্লেষকদের মতে এই অসহায় বানিয়ে দেওয়া মানুষদেরকে কারখানার বেগার শ্রমিকে পরিণত করা হবে! শুধু পেটের তাগিদে তাঁরা গোবাদি পশুর মতো দিন রাত কাজ করে যাবে কোনো কিছু চাইবে না, বেতন, কাজের পরিবেশ, সুযোগ-সুবিধা, শ্রমিক সংগঠন, ... কিছু না। অমানবিক শুধুমাত্র মুনাফা-তাড়িৎ পুঁজিবাদ নির্ভর শাসন-ব্যবস্থার এটাই চরিত্র!

দেশের ও মানবতার প্রতি এইরূপ চরম বিপর্যয় মেনে নেওয়া যায় না। তাই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, সচেতন মানুষেরা এর প্রতিবাদ করছেন। তাঁরা এন.পি.আর., সি.এ.এ. ও এন.আর.সি.-এর সাধারণভাবে প্রত্যাহারের দাবিতে প্রতিবাদ করছেন। আমার মতে এই তিনটি বিষয়ের যেখানে যেখানে অসুবিধা সেইখানে প্রতিবাদ কেন্দ্রিভূত হওয়া দরকার।এন.পি.আর. ২০১০ সালে প্রথম হয়েছে, কারও অসুবিধা হয় নি। সুতরাং, ২০১০ সালের ফর্মেই এন.পি.আর. হোক; বাবা-মায়ের জন্মের তারিখ বা জন্মস্থান সম্পর্কিত বা তদনুরূপ অবাস্তর /দুষ্প্রাপ্য নতুন কোনো তথ্য চাওয়া যাবে না। “এরূপ তথ্য ঐচ্ছিক” – এটা একটা ফাঁদ।কারণ, যাঁদের ফর্মে কিছু তথ্য থাকবে না, তাঁদেরকে পরে “সন্দেহজনক” বলে চিহ্নিত করা হবে ও এন.আর.সি. তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেশহীন করা হবে – এই সম্ভাবনা প্রচুর। তাই, কোনো ফর্মেই কোনো তথ্যই “ঐচ্ছিক”-এর মরিচিকায় থাকবে না, থাকবে শুধু যুক্তিযুক্ত বাস্তবতায় বাধ্যতামূলক তথ্য।অনুরূপভাবে, সি.এ.এ.-এর ব্যাপারে তার উৎস ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব সংশোধনী অইনে নবপ্রথিত ১৪এ ধারাটি বাতিল বা সংশোধনের দাবি করা দরকার। কারণ, সেই ধারাটিই সরকারকে যা খুশি তথ্য চাওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে।তাই, আমাদের দাবি হওয়া উচিৎ যে এন.আর.সি. হোক, কিন্তু বাস্তবসম্মত তথ্যের ভিত্তিতে; যেমন নাগরিক হওয়ার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ, নির্বাচন কমিশনের ভোটার পরিচয়পত্র, ইত্যাদির ভিত্তিতে।

হতাশার কারণ নেই। যখন মহিলা ও ছাত্ররা জেগে যায় তখন যে কোনো অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়; তানাশাহি থেকে তানাশাহি রাষ্ট্রক্ষমতাও তাঁদেরকে উপেক্ষা করতে পারে না। সত্যের, ন্যায়ের, মানবতার সংগ্রাম সর্বদা কন্টাকীর্ণ কিন্তু অসম্ভব নয়। দেশবাসী সেই আশায় জেগে আছেন।

---